



মাসি Wilkinson-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ

যখন ভাবলাম, আমাদের কথাবার্তা শুরু করার মুহূর্তটা অবশেষে এসেছে, তখনই তিনি হাল ধরলেন।

“আমার সঙ্গে ও-ঘরে এসো।

তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।”

“কী?”

আমরা একটা হলঘরে ঢুকলাম, প্রায় আমার এখনকার ফ্ল্যাটটার সমান বড়।

মোটামুটি একশো সত্তর বর্গমিটার।

তার মাঝখানে একটা বিলিয়ার্ড টেবিল।

তিনি জানতে চাইলেন, খেলাটা আমি জানি কি না।

খেলতে পারি কি না।

বললাম, হ্যাঁ।

বুঝিয়ে বললাম, Goriziana — মানে সাবেকি ইতালীয় ধরনটা — আমার তেমন পছন্দ নয়, আমার ভালো লাগে আমেরিকান পুল।

তিনি হাসলেন।

“তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি আগেই জানতাম।”

সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি মহারানির গোয়েন্দা বিভাগের পেছনে টাকা খরচ করেছেন, না আমার বইগুলো বিনা পয়সায় পড়েছেন, নাকি সোজা আমার মায়ের কাছেই আমার খোঁজখবর নিয়েছেন।

তিনি উত্তর দিলেন না।

কিংবা হয়তো নীরবতা দিয়েই উত্তর দিলেন।

তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন একটা লম্বা টেবিলের দিকে।

তার ওপর সাজানো ছুরি-কাঁটা-চামচের সেট, ম্যানিকিউরের কিট, পেডিকিউরের কিট, আর শরীরের যন্ত্রের
অজস্র জিনিস।

সবই পালিশ করা ইস্পাতের।

জেল্লা ধরে রাখতে প্রতিটি জিনিস প্রতি সপ্তাহে পালিশ করা হত।

কিন্তু আমার নজর কেড়েছিল অন্য কিছু।

প্রতিটি জিনিসের গায়ে একই প্রতীক।

দুটো তলোয়ার।

ব্র্যান্ড।

স্বাক্ষর।

পরিচয়।

Wilkinson Sword।

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরন নেমে গেল।

এই প্রথম সত্যিই বুঝলাম, আমি কোথায় আছি।

আমি কোনো ম্যানেজারের অতিথি নই।

কোনো উচ্চপদস্থ কর্তার অতিথি নই।

এমনকি কর্পোরেট জগতের কোনো কিংবদন্তিরও অতিথি নই।

একসময় শুনলাম, মেয়েলি গলায় কারা তাঁকে ডাকছে।

“মাসি...

মাসি...

কোথায় তুমি?”

একটুও দ্বিধা না করে তিনি উত্তর দিলেন:

“এই আসছি।

আমি আমার ভাগ্নের সঙ্গে আছি।

Gillette-এর ছেলে।”

সেই মুহূর্তে আমার আর কোনো সংশয় রইল না।

আমি আমার মাসির বাড়িতে।

আমরা আগের ঘরে ফিরে এলাম।

সবাই বেরোনোর জন্য তৈরি।

সবাই, শুধু আমি ছাড়া।

ম্যাগি আমার হাত ধরে বললেন:

“এসো, আমার মেয়ে আর দুই নাতনির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

দুজনের কারোরই বিয়ে হয়নি।

চলো।

তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।

আশা করি, দেখে তুমি খুশি হবে।”

সত্যি বলতে, আমি তখন পুরোপুরি মাতাল।

মদে নয়।

তথ্যে।

আবেগে।

সময়ে।

এর কিছুই আর হজম করতে পারছিলাম না।

অথচ তিনি, ওই ছোটখাটো ইংরেজ বুড়ি, ছিলেন এক ভূমিকম্প।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যৌবনে তিনি না জানি কেমন ছিলেন।

আর তাঁকে সামলানো আদৌ কারও সাধ্যে কুলিয়েছিল কি না।

উত্তরটা আপনা থেকেই এল।

না।

তিনি ছিলেন তার উর্ধ্ব।

তিনি ছিলেন ইস্পাতের নারী।

আমরা একটা পরিত্যক্ত কারখানার সামনে এসে পৌঁছলাম।

তিনি থামলেন।

চুপচাপ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর বললেন:

“ফের্নান্দো।

সবকিছুর শুরু এখানেই।

আর ওরা যদি তোমাকে আগে চিনত, আমাদের কোম্পানিটা আজও আমাদেরই থাকত।

অদক্ষ পরিচালনা আর উদ্ধত সব সিদ্ধান্তের জন্য ওটা বেচে দিতে আমরা কখনও বাধ্য হতাম না।”

তঁার মেয়ে।

তঁার নাতনিরা।

সবাই চুপ।

এমনকি দোমিনিককেও অভিভূত মনে হল।

তারপর সে বলল:

“এ হল সেই আবেগের সফর, অতিথিদের মুগ্ধ করতে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা যা বরাবর করিয়ে থাকেন।

বরাবর সেই একই ইংরেজি আচার-অনুষ্ঠান।”

কিন্তু এবার তিনি কোনো অতিথির সঙ্গে কথা বলছিলেন না।

কথা বলছিলেন তঁার ভাগ্নের সঙ্গে।

সফর শেষ হলে ওঁরা আমাকে গাড়িতে হোটеле পৌঁছে দিলেন।

ফিরতে চেয়েছিলাম আমিই।

এক দিনে এত আবেগ শুধে নেওয়ার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না।

তবে পরদিন আমাদের আবার দেখা হবে।

ফের্নান্দো